শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

সূত্র মানে সহজ বাংলায় খেই। একটা জটপাকানো সুতোর বাণ্ডিলে খেই বা মুখটি খুঁজে পেলে সে-জট ছাড়ানোর সুবিধে হয়। জীবনকে বাসনার জালে জট পাকিয়ে আমরা দিব্যি থাকি। কিন্তু কারও মনে যখন এই জালের জটলা থেকে মুক্তির ইচ্ছা জাগে তখন সে এই জটের খেই খোঁজে, আর সেই খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই শাস্ত্র সূত্ররূপে হাজির হন তার কাছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সবই প্রায় সূত্রাকারে লেখা, অথবা ছন্দে তার প্রকাশ। সেযুগে তা স্মৃতিতে ধরে রাখা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। ছন্দে অথবা বীজাকারে সূত্ররূপে তাকে শ্রুতিতে ধরে রাখা হত। এই সূত্রগুলি কী? আলোকপ্রাপ্ত মহাপুরুষের অনুভবে যে-সত্য ধরা দিত তা অনির্বচনীয়, অর্থাৎ তাকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা যায় না। তাই তাকে নিকটতম শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে সূত্রাকারে প্রকাশ করা হত, যাতে ঋষিমুনিদের মননে সেগুলি সত্যের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। তাঁরাও সাধারণ মানুষের জন্য সেই সূত্রের টীকা, ভাষ্য প্রস্তুত করে পরম্পরাক্রমে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এসবই সত্যের আভাস মাত্র দেয়, সত্য গুহাতেই নিহিত থাকে। তাই তাকে বাক্যে প্রকাশের চেষ্টায় সূত্রগুলির টীকা, ভাষ্যের শেষ আর হয় না। আবার সত্য অনন্ত তাই তার জ্ঞানও অনন্ত—'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্', অতএব সেই অনন্তকে প্রকাশের চেষ্টাও অনন্তভাবে হতে থাকে। 'একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সেই একই সত্যকে মুনিরা এক-একজন এক-এক ভাবে ধরার চেষ্টা করেন। বস্তু এক, কিন্তু তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। তাই সেই সত্যকে প্রকাশের চেষ্টার কোনওটিই ফেলনা নয় কারণ সবগুলিই সেই সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে সেই অনন্ত কখনও কখনও সান্ত হয়ে নররূপ ধরে মানুষের মধ্যে নেমে আসেন, তখন এই সূত্রগুলি নবজীবন পেয়ে তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। অসংখ্য মতের গোলকধাঁধায় মানবমনে যে-সংশয় জমে উঠতে থাকে তা দূর করে তিনি সত্যপথের এক নির্দিষ্ট রূপরেখা দিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অনন্তের ঘনীভূত রূপ, এসেছিলেন সংশয়রূপী রাক্ষসের মহাস্ত্ররূপে—'সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্'। তিনি বলতেন, 'শাস্ত্রে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

বালিতে চিনিতে মিশেল আছে', চিনিটুকু নিতে গেলে পিঁপড়ে হতে হবে। আমরা ভাবি, চিনিতে বালি মেশানোর দরকার কী ছিল? আসলে বালি কেউ মেশায় না, বালি এখানে অনুকল্প, শাস্ত্র যা সরাসরি বোঝাতে পারেন না তাকে বোঝাবার চেষ্টায় নানা অনুকল্প ব্যবহার করেন। সুবর্ণরেখা নদীতে সোনা আছেই, কিন্তু তা পেতে মণ মণ বালি ছাঁকলে এক কণা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তেমনি শাস্ত্র মন্থন করে তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করা দুরূহ। এছাড়াও শাস্ত্রের মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে বালি আর কোনটিই বা চিনি তা বেছে নেওয়া আরও দুরূহ। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, শাস্ত্র দূর থেকে শোনা হাটের হো-হো শব্দ—এক অর্থহীন শব্দের মিশ্রণ যা আমাদের বোধগম্য হয় না। একমাত্র হাটে পৌঁছতে পারলে তবেই শোনা যায় নানা মানুষের বেচা-কেনা, দরাদরির কথোপকথন। তাহলে শাস্ত্র নামক এই হাটের অর্থহীন শব্দের প্রয়োজন কোথায়? প্রয়োজনটি নিশ্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হাট যেমন ওই হো-হো শব্দ দিয়ে তার দিক নির্দেশ করে, তেমনই শাস্ত্র সেই সত্যের পথনির্দেশ করে শুধু নয়—তার প্রতি আকর্ষণও বৃদ্ধি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, বরং তাঁর নিরক্ষর বলে খ্যাতি আছে। কৌতুক করে বলতেন, ''আমি মূর্খোত্তম।'' তিনি এসেছিলেন লাউ-কুমড়োর মতো আগে ফল তার পরে ফুল হয়ে, বহুভাবে ঈশ্বরকে আস্বাদন করে তাঁর অনুভব দিয়ে শাস্ত্রকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে। তিনি অক্ষরপুরুষ, তাই লেখনীমুখে অক্ষরমালায় সাজাতে হয়নি কিছু। তিনি যা বলেছেন তা-ই শাস্ত্র হয়ে উঠেছে। এক প্রাচীন সাধুর অনুরোধে পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ থেকে সূত্রাকারে কিছু উক্তির সংকলন করেছিলেন। তাঁরই অনুমতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র নিয়ে কিছু লেখার এই প্রয়াস।

সূত্র ১ : কামিনী-কাঞ্চনই মায়া

মায়া শব্দটির প্রয়োগ ব্যাপক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দয়ার সঙ্গে যোগ করে এটিকে এক মানবিক গুণ হিসাবে দেখা হয়। প্রাচীনকালে নানা রূপ ধারণের ক্ষমতাকে মায়া বলা হত—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে—মায়াশক্তির দ্বারা ইন্দ্র নানারূপ ধারণ করেন। হয়তো সেজন্যই জাদুবিদ্যার নাম 'ইন্দ্রজাল' দেওয়া হয়েছে। অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্ম ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা। ঈশ্বর ও মায়াশক্তিকে তাঁরা মানেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করছেন দেখে অদ্বৈতী তোতাপুরী বলেছিলেন, ''কিঁউ রোটি ঠোকতে হো!'' তাঁরা বলেন মায়া মিথ্যা, কিন্তু এই ব্যাবহারিক জগৎরূপ ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকতে পারে না, তাই অজ্ঞানের অবস্থান জীবে। সেখানে অজ্ঞান কোথা থেকে এল? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা স্পষ্টভাষী, তাই তাঁরা বলেন এর উৎস জানা যায় না, তবে আমাদের যা দরকার তা হল—জ্ঞান হলে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়। কবে শুরু হয়েছে তা জানা যায় না তাই এটি অনাদি, কিন্তু সান্ত, যেহেতু জ্ঞানে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ''সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—এই অজ্ঞানের জগতে আমরা যা কিছু করি তা শেষপর্যন্ত জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। আর একভাবে বলা হয় যে, মায়া বা অজ্ঞান—যে-নামেই তাকে ডাকা হোক তা কার্যকারণের অতীত। আমাদের বোঝার অস্ত্র যুক্তি কার্যকারণের অধীন, তাই তা দিয়ে যেমন ব্রহ্মকে নিরূপণ করা যায় না সেইরকম এই বিষয়টিও নিরূপিত হয় না।

স্বামীজী পাশ্চাত্যে মায়ার ওপর তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের অনুরোধ করেছিলেন খুব মন দিয়ে শুনতে কারণ বিষয়টি দুরূহ। দুরূহ এইজন্য যে, যে-জগৎ আমরা দেখছি ও ব্যবহার

করছি তা সত্যের ওপর আরোপিত একটি ভ্রান্ত সত্তা, যদিও এ-বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ করা যায় না। প্রশ্ন উঠবে যে, যা যুক্তিসিদ্ধ করা যায় না তা জানার প্রয়োজনটাই বা কী? এমনিতে অবশ্যই প্রয়োজন নেই, তবে যাঁরা এ-জগতে নিরন্তর দুঃখের ভাগ দেখে তার কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁদের প্রয়োজন আছে বই কী। বিরুদ্ধশক্তিকে না জানলে লড়াই হবে কার সঙ্গে! কোনও অনুভব ভ্রান্ত কী না বোঝা যায় সে-ভ্রান্তি কেটে সত্যের অনুভব হলে, এবং শাস্ত্রে উদ্ধৃত অনুভবের সঙ্গে মিলে গেলে। জেগে উঠলে তবেই বোঝা যায় আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বামীজী রাজস্থানের মরুপথে হেঁটে চলেছেন, পিপাসার্ত। হঠাৎ দেখলেন একটু দূরে বিশাল সরোবরের জল চিকচিক করছে, তাতে পাশের খেজুর গাছের ছায়া পড়েছে। স্বামীজী এগোলেন সরোবরের দিকে, কিন্তু খানিক এগোতেই সব মিলিয়ে গেল। বুঝলেন, এতদিন বইতে যা পড়েছিলেন সেই মরীচিকা এটি। এর পরেও অনেকবার তার দেখা পেয়েছেন কিন্তু তখন জ্ঞান হয়ে গেছে যে ওই জলের হাতছানি ভ্রান্তিমাত্র, তাই আর ভ্রমে পড়েননি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন যে, মায়াকে জানতে পারলে সে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। ব্রহ্মানুভূতি হলে এই জগৎ থাকে না, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে আবার এই জগতের অনুভব হলেও সেটি যে একটি আরোপিত সত্তা তার জ্ঞান দৃঢ় থাকে। এই বোধ থেকেই জগতকে মিথ্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

তাহলে মায়া কী? এই বহমান সংসার নিরন্তর আমাদের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে আর আমরা তাকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছি—এটিই মায়া। নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দর্শনের দিন দক্ষিণেশ্বরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ করে মায়াতীতের রাজ্যে নিয়ে চলেছিলেন। আতঙ্কে নরেন্দ্রনাথ চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, ''ওগো, তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন।''[১] ঠাকুর বলতেন, সব শক্তির 'অন্ডারে'। আমরা এই 'অন্ডারে'ই অভ্যস্ত। স্বামীজী তাই মায়া সম্বন্ধে বলছেন, এই সংসারগতি বর্ণনার নামই মায়া। এ-জগতে যা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি এবং যা কিছু ঘটছে, তা স্থূল-সূক্ষ্ম যাই হোক, সবই এই মায়ার অন্তর্গত। স্বামীজী বলছেন, ''আমরা যে কখনও কখনও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি, পরোপকারের চেষ্টা করেছি। সেগুলি স্মরণ করে ভাবতে পারি—'কেন, ওই কাজগুলি তো আমরা বুঝে, ভেবে-চিন্তে করেছিলাম'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সেগুলি না করে থাকতে পারিনি বলেই ওইভাবে করেছিলাম। আমাকে এইস্থানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে, আর আপনাদের বসে তা শুনতে হচ্ছে—এটাও আমরা না করে থাকতে পারি না বলেই করছি। আপনারা বাড়ি ফিরে যাবেন, হয়ত কেউ এ-থেকে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করবেন, অপরে হয়ত মনে করবেন—লোকটা অনর্থক বকছে। আমি বাড়ি গিয়ে ভাবব, আমি বক্তৃতা দিয়েছি। এটাই মায়া।''[২] এই মায়ার ব্যাপ্তি এতটাই যে শ্রীমা বলছেন, ''বাবা, কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া—কালে আসছে, যাচ্ছে।''[৩] কথামৃতকার শ্রীম স্বামীজীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং' মানতেন, 'জগদ্ধিতায় চ' মানতেন না। তাঁর এবং আরও অনেকেরই মনোভাব ছিল এই : ''স্কুল, হাসপাতাল, নারায়ণসেবা এসব তো মায়ার রাজ্যের কথা। মুক্তির চেষ্টা না করে এসবের অর্থ কী?'' এই সংশয়ী প্রশ্নের সামনে স্বামীজীকে অনেকবারই পড়তে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর : ''আমরা তো নিত্যমুক্ত। আমাদের মুক্তির চেষ্টাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়?''

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এইসব ভারি ভারি তত্ত্বের মধ্যে যাচ্ছেন না। তিনি একটা সংজ্ঞা দিলেন—

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। এটিই হল খেই বা সূত্র, যা ধরে ধরে গেলে আমরা মায়ার জটের বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাব। মায়া এই দ্বন্দ্বমূলক জগতের জন্মদাতা। এখানে ভাল-মন্দ, সাদা-কালো, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, রীত-বিপরীতের সমন্বয়। তাই মায়াও যেন নিজেকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটির নাম বিদ্যা, অপরটির নাম অবিদ্যা। মায়ার এক অংশ বাঁধেন আবার অপর এক অংশ সে-বাঁধন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। যে-অংশটি আসক্তি হয়ে সংসারকে আমাদের উপাদেয় বোধ করান সেটি অবিদ্যা, আর যেটি এই আসক্তিকে বন্ধনের দড়িরূপে জানিয়ে দেন ও অনাসক্তির উপায় অবলম্বন করতে বলেন সেটি বিদ্যা মায়া। 'ঠাকুর-ঠুকুর' যে-মায়া অবলম্বন করে জগতে আসেন তা ওই বিদ্যা মায়া, আর সেই বিদ্যা মায়াকে আমাদের সামনে তুলে ধরে তার পথটি সহজ করে দিয়ে যান। মায়া নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক ধোপা তার গাধাকে নিয়ে এক জলাশয়ে কাপড় কাচতে এসেছে। গাধার পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে দেখে যে সে গাধাটিকে বেঁধে রাখার দড়ি আনতে ভুলে গেছে। সমস্যা—কাচা, শুকোনো সময়সাপেক্ষ। তার ব্যস্ততার ফাঁকে যদি গাধাটি কোথাও চলে যায় তো মুশকিল। বিব্রত হয়ে ভাবছে, এমন সময় দূরে একটি গাছের নিচে বসে থাকা বৃদ্ধ ব্যাপারটা বুঝে বলল, ''ভাবতে হবে না। গাধাটার পায়ের কাছে হাত ঘুরিয়ে বেঁধে দেওয়ার ভান করো, গাধা কোথাও যাবে না।'' ধোপা আর কী করে, সন্দেহ থাকলেও তেমন করল। গাধা দাঁড়িয়ে রইল সারাদিন। সব কাজের শেষে গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে এবার গাধাকে চলতে বললেও আর সে নড়ে না। এ আবার কী হল? তখন সেই বসে থাকা বৃদ্ধটি আবার বলল, ''আরে বাবা, যেমন বেঁধেছিলে সেই রকম খুলে দেওয়ার ভান করো, তবে তো গাধা এগোবে!'' ধোপা তাই করতেই গাধা আবার পথ চলতে লাগল। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

হরি মহারাজ চিঠিতে লিখছেন, ''বন্ধন বাহিরে কোথাও নাই। আপনার মনে বন্ধন, ভ্রান্তিবশতঃ বাহিরে অনুমিত হয় মাত্র। কিন্তু তা বুঝিতে পারিলেও বন্ধনমুক্ত হওয়া সহজ নয়।'' আমরা যে এই মিথ্যা বন্ধনকে স্বীকার করে বাঁধা থাকি তা যুক্তি দিয়ে বুঝলেও তাকে অস্বীকার করে পথ চলা খুব কঠিন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের লড়াই করার প্রতিপক্ষকে দুটি শব্দে ধরে দিচ্ছেন, বলছেন, ''কামিনী-কাঞ্চনই মায়া।'' মজা হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য উদ্দীপনেই ভাবসমাধিতে ডুবে যান, অথচ জগৎ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা অদ্ভুত। তাঁর বাস্তববোধ তাঁকে সমাধিতে ডুবে থাকতে না দিয়ে জগদম্বাকে প্রার্থনা করাচ্ছে—''মা আমাকে বেহুঁশ করিসনি, আমি এদের সঙ্গে কথা কব।'' তিনি জানেন যে সাঁতার দিতে জানাই আসল কথা। মানুষের সাঁতার কাটতে পারার পেছনে কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে তা না জানলেও মানুষ সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে পারে। তার দরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের মানসিকতা; এবং সে-শক্তি কী অবলম্বন করে আমাদের সামনে হাজির হয় তা জানা। মায়ার 'ফ্যালাজফি' নিয়ে চর্চার তত দরকার নেই, দরকার যে-হাত ঘুরিয়ে আমাদের বেঁধেছেন তার গিঁটটি কোথায় আছে তা জেনে নেওয়া। এই গিঁটটি হচ্ছে আমাদের আসক্তি যার বীজ কামিনী আর কাঞ্চন। এই বীজ থেকেই সংসারের উৎপত্তি। তার সার আর জল আমাদের আসক্তিজনিত কর্ম—'কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'। এই আসক্তির জন্য ''সংসারে কেউ নেই তবু হরির জন্য কাশী যাওয়া হয় না, বলে আমার হরিকে কে দেখবে।'' এ যেন শংকরাচার্যের ''কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ/ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।'' খুব জানি, খুব বুঝি যে, এই সংসারে কেউ আমার নয়, একাই আসা, একাই

যাওয়া, এটাই নিয়তি। কিন্তু—এই কিন্তুটিই আমাদের আসক্তির অনুভব যার হাত থেকে মুক্তি পেতে লড়াইয়ের প্রতিপক্ষকে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে হাজির করে দিয়েছেন। নারীপুরুষের যৌথ কামনায় সংসার, তাই কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী একা দায়ী নয়, কামী পুরুষও সমভাবে দায়ী। যার পক্ষে যেটি মায়ার রূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে স্বামীজীর যা হয়েছিল তার প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল তাঁর শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শিষ্য স্বামীজীকে বললেন, তিনি পাশ্চাত্যে দেওয়া স্বামীজীর মায়ার ওপর বক্তৃতা কয়েকবার পড়েছেন কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি, তিনি স্বামীজীর মুখ থেকে তা বুঝে নিতে চান। স্বামীজী অন্য প্রশ্ন করতে বললেন। কিন্তু শিষ্য নাছোড়। তখন স্বামীজী বলতে শুরু করলেন। স্বামীজীর কথা শুনতে শুনতে মন্মথের অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়-রাজ্য ছাড়িয়ে এক অতি সূক্ষ্ম সত্তা অনুভব করল। তাঁর চোখের সামনে ঘরবাড়ি সবই প্রবলবেগে কম্পিত হতে লাগল। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য-জগৎ এক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আবার এই জগতে মন ফিরে এল বটে, কিন্তু একটা স্বপ্নের ঘোর যেন লেগে রইল। তখন স্বামীজীর প্রতি তাঁর পূর্বের ভয়-সংকোচের ভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। তার স্থলে তিনি অনুভব করলেন : ''এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্র বর্তমান। স্বামীজী, এই মঠ প্রভৃতি এবং আমি—সব যেন তার মধ্যে এক অংশ।'' তিনি বললেন, ''স্বামীজী! আপনিও তো মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা—এসবও তো মায়া। আপনার এসব করবার কি দরকার?'' স্বামীজী হেসে বললেন, ''হ্যাঁ! তুই ঠিক বলেছিস। আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা করছি। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব।''[৪]

'অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং তস্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া'—স্বামীজী লীলায় এই অনিত্য জগতের দুঃখে নিজের মন সমাহিত করে দুঃখমুক্তির উপায় স্থির করেছিলেন, এছাড়া আমাদের জন্য তাঁর হৃদয়ের রক্তমোক্ষণের আর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মায়ার পারে গেলে তবে মায়ার লীলা বোঝা সম্ভব ও সেই লীলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব। সেই একের ইচ্ছা থেকে বহু এবং বহুর বিচিত্রতার ভোগ-দুর্ভোগের লীলা, যে-লীলায় আমরা অংশীদার নই—দাবার বোড়ে মাত্র। ''যে কলে জেনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,/ কোনও কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।'' সেই মায়া শক্তি মনকে দিয়েছে আঁখি ঠারি, তাই সে এখন সংসার করছে। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, খণ্ড ১, ২০০১, পৃঃ ৮৪ [এরপর, *যুগনায়ক*]

২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ২, ২০০০, পৃঃ ৬-৭

৩। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৪, পৃঃ ২৩১

৪। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১, পৃঃ ১০৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* মে মাস থেকে পত্রিকাবর্ষ আরম্ভ হয়। পত্রিকার ফ্ল্যাপে গ্রাহক মেয়াদের উল্লেখ থাকে। যাঁরা এখনও নবীকরণ করেননি তাঁদের তা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।